125

ভোরের কাগজ

তারিখ 04 JAN 1994 ... পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 8 ...

ছাত্রদের হাতে অন্য বই, খাতা, পেন্সিল

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

নতুন বছরের প্রথম দিন দেশের সব মানুষের কাছে প্রত্যাশা আর আশা-আকাঙ্খা পূরণের প্রতীক। নববর্ষ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে নতুন প্রত্যাশা ও উপলব্ধির চেতনা। উনিশশো চুরানব্বই সালও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং সমস্যাপীড়িত বাংলাদেশে নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে। পয়লা জানুয়ারি বিদেশের মতো এদেশেও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। এই উদযাপনের মধ্যে পয়লা জানুয়ারি আরও একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও অনুভবযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ করে বলেছেন, ছাত্রদের হাতে বই, খাতা আর পেন্সিল দেখতে ইচ্ছুক। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

বই, খাতা আর পেন্সিলই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের নিত্যসঙ্গী- একথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবুও এই প্রয়োজনীয় বোধটির অস্তিত্ব যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখন মানুষ চিন্তিত হয়ে ওঠে। এই চিন্তার কারণ একাধিক। একজন সৈন্যের হাত থেকে অস্ত্র যখন একজন কৃষকের হাতে যায়, তখন কৃষক তার ব্যবহারে অপারগ হয়ে পড়ে। আবার একজন সৈন্যের হাতে যখন বস্ত্রমিল চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে শুধু যে অক্ষম হয়ে পড়েন তা নয়, অদক্ষ হাতের স্পর্শে দক্ষতার মৃত্যু ঘটে। এই দিকটি ছাত্রদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে সমাজে যাদের গুরুত্ব অত্যধিক, যাদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা অনেক, তাদের বিরুদ্ধাচরণে মানুষ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, সমাজের স্থিতিশীলতায় ঘটে বিপুল পরিবর্তন। শঙ্কিত চিত্রের বিবর্ণরেখা মানুষের জীবনকে বিপথগামী করে তোলে।

ছাত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'স্টুডেন্ট' যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা অত্যন্ত সচেতনভাবে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা চিন্তা করে শব্দটি গঠন করেন। সংস্কৃত শ্লোকেও একথাই গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে : ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রদের কাছে অধ্যয়নই হচ্ছে একমাত্র তপস্যা। এই তপস্যার জন্য প্রয়োজন তার বই, খাতা আর পেন্সিল। ছাত্রজীবনে এগুলো নতুন নয়। তবুও কেন এই দিকটি বিংশ শতকের শেষপাদে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে? তার কারণ, ছাত্রদের কক্ষচ্যুতি ঘটেছে। আর কক্ষচ্যুতির জন্যই যে-ছাত্রের হাতে বই, খাতা শোভা পেত, তার সেই শোভা নষ্ট হয়ে গেছে। তার পকেটে বা দেহে এখন অস্ত্র লুকনো, বইয়ের সঙ্গে কতদিন তার সম্পর্ক নেই তা সে নিজেও জানে না। টেবিলের ওপর থেকে বই, খাতা অদৃশ্য হওয়ার পর তার নিজের জীবনেও দুশ্চিন্তা আর চাঞ্চল্য এসেছে, সেই সঙ্গে অভাব দেখা দিয়েছে নিরাপত্তার।

ছাত্রদের কাছ থেকে বই খাতা নির্বাসিত হওয়ার পেছনে যে কারণ ক্রিয়াশীল তা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে পাঠবিমুখতা বা অস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়নি। সে সময় ছাত্রদের মুখ্য আদর্শ ছিল পড়াশোনা করে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করা। এজন্য ছাত্রদের কাছে অধ্যয়নই ছিল একমাত্র তপস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে সমর্থন করতেন। ছাত্রদের যে আদর্শ ছিল তা কোনো মূল্যেই তখন বিক্রীত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি সাধারণভাবে কোনো রাজনৈতিক দল অনুযায়ী পরিচালিত হতো না। এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে নিজস্ব আদর্শে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলা সহজসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রে আরও একটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে দু'একটি কলেজ ছাড়া কলেজের ছাত্ররা রাজনীতিতে ততোখানি উৎসাহী ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই অধিকাংশ কলেজে লেখাপড়ার একটা ভালো পরিবেশ ছিল, ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত ও হানাহানি ছিল অনুপস্থিত।

দেশের সরকারের পক্ষে শিক্ষাঙ্গনের রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সরকার ইচ্ছা করলেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গন থেকে অসন্তোষকে দূরে রাখতে পারেন। প্রাক-বাংলাদেশ আমলে স্কুল ও কলেজকে বহুলাংশে ছাত্র রাজনীতির অসন্তোষের বাইরে রাখা হতো। বিশ্ববিদ্যালয়েও সরকার রাজনীতি করতে চাইতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি প্রবেশ করতো মূলত দু'টি কারণে। প্রথমত: ছাত্রদের দলগত আদর্শের পরিপূরক হিসাবে। দ্বিতীয়ত: বিরোধী দলের স্বার্থ সংরক্ষণে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। পাকিস্তান আমলে এদেশের বিরোধী দল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ছাত্রদেরই ব্যবহার করতেন। তার কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে সুষ্ঠু রাজনীতি বিকাশের একটা সহজ পরিবেশ গড়ে ওঠে। দেশের জনসাধারণ ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা চিন্তা করতেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছিল গণমানুষের ওপর অসীম প্রভাব। যে কোনো ইস্যু সামনে রেখে ছাত্ররা আহ্বান করলে জনসাধারণ এগিয়ে আসতে দ্বিধা করতেন না। দেশের লোক মনে করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশের গণমানুষের প্রতিধ্বনি, আদর্শের সম্মিলিত ধারা। ছাত্রদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল সন্ত্রাস, অন্যায়বোধ ও অপ্রীতিকর কাজ। আজ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনের ছাত্ররা তাদের পূর্বকালীন নৈতিক আদর্শ, শ্রদ্ধাবোধ ও সার্বিক ইমেজ হারিয়ে ফেলেছে। জনসাধারণ এখন ছাত্রদের অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ, বিরক্ত ও শ্রদ্ধাহীন। ছাত্রদের তাঁরা দেখেন বিভীষিকা হিসাবে। জনসাধারণের ওপর এখন ছাত্র সমাজের প্রভাব অনুপস্থিত। বর্তমানে হলের অনুষ্ঠানে ডেকোরেটর আসতে চান না মঞ্চ সজ্জার জন্য, শিল্পী আসতে চান না গান গাইবার জন্য, কোনো ব্যবসায়ী হাত বাড়িয়ে দেন না সাহায্যের জন্য। তাঁদের কাছে ছাত্রসমাজ কালো রাতের অন্ধকারের মতো।

সেদিনের ছাত্রসমাজ বই, খাতা ছুঁড়ে ফেলে এমন অন্ধকার জগতে ঢুকেছে কেন? এর উত্তরে বলা হয়, ছাত্রসমাজ স্বেচ্ছায় এই কালো অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেনি। তাদের প্রবেশ করানো হয়েছে অর্থের লালসার আগুন জ্বালিয়ে। এই অর্থপ্রাপ্তির স্বপ্ন, অধিকারের স্বপ্ন তাদের ছাত্রত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছে।

ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় পাকিস্তান শাসনামলেই, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী গভর্নর মোনায়েম খাঁর শাসনের সময়। সে সময় প্রত্যক্ষভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব পড়ে ছাত্রসমাজের ওপর। এর ফলে গঠিত হয় সরকারি সমর্থনপুষ্ট একটি ছাত্র সংগঠন। শুরু হয় বিভিন্ন ছাত্রসমাজের মধ্যে সংঘাত। যে সংঘাত এই সময় শুরু হয় তার পুনরাবৃত্তি চলছে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

> **ছাত্রসমাজের প্রকৃত ছাত্রত্ব ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সরকার ও রাজনৈতিক দল—উভয় পক্ষের। বিরোধী দল যদি নিজের দায়িত্ব পালন করতে অনীহা প্রকাশ করেন বা অসমর্থ হন, তাহলে এককভাবে সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষ নিজের ছাত্র সংগঠনের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলে সাধারণ ছাত্রদের অস্ত্র নিবারণও অসম্ভব হবে না।**

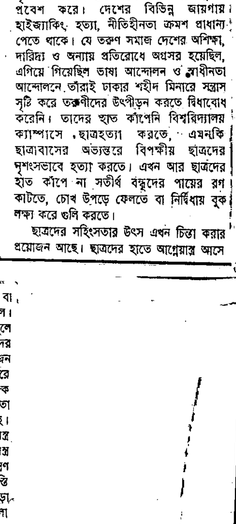

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সমাজে যেমন অবক্ষয় দেখা দেয় তার প্রভাব বহুলভাবে প্রসারিত হয় ছাত্রসমাজের ওপর। তার কারণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের পর একশ্রেণীর ছাত্ররা অস্ত্র, সুযোগ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। প্রথম পর্যায়ে শৃঙ্খলার অভাবে ছাত্রসমাজে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় হাইজ্যাকিং, হত্যা, নীতিহীনতা ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। যে তরুণ সমাজ দেশের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অন্যায় প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরাই ঢাকার শহীদ মিনারে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তরুণীদের উৎপীড়ন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের হাত কাঁপেনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রহত্যা করতে, এমনকি ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরে বিপক্ষীয় ছাত্রদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে। এখন আর ছাত্রদের হাত কাঁপে না সতীর্থ বন্ধুদের পায়ের রগ কাটতে, চোখ উপড়ে ফেলতে বা নির্দ্বিধায় বুক লক্ষ্য করে গুলি করতে।

ছাত্রদের সহিংসতার উৎস এখন চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আসে পরিচিত একটি অঙ্গন থেকে। এখানে সরকার বা বিরোধী দল দু'পক্ষই সমানভাবে ক্রিয়াশীল। সরকার যেমন স্বপক্ষীয় ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন, বিরোধী দলও একই প্রক্রিয়ায় নিজেদের দলীয় ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন। একজন সাধারণ ছাত্রের পক্ষে নিজের টাকা খরচ করে অস্ত্র কেনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ কিছুসংখ্যক মানুষ অস্ত্র ও বোমা তৈরি করা শিখে তা ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়তঃ অর্থবান ছাত্ররা বাইরে থেকেও অস্ত্র পেয়ে থাকে। ছাত্রদের নিরস্ত্র করার জন্য অস্ত্র আসার এই তিনটি পথ বন্ধ করার কঠিন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যে কোন অস্ত্রধারীর জন্য শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ছাত্রসমাজকে রক্ষার বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র প্রবেশের পর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাদের দলভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। তার ফলে ছাত্ররা নিরপেক্ষতা হারিয়ে সন্ত্রাসের পথে অগ্রসর হয়। পার্টির কাছ থেকে অস্ত্র ও অর্থ লাভ করে শিক্ষাঙ্গনের অসংখ্য মেধাবী ছাত্র নির্জীব হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন সহিংস রাজনীতি চর্চার সঙ্গে ড্রাগস সেবনের পর ছাত্ররা নিজেদের জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছে। যে অভিভাবক নিজে অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে নিজের ছেলেকে শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর জীবনেও নেমে আসে পরাজয়ের বেদনা।

একশ্রেণীর ছাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুবিধার এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে যেখান থেকে তারা সহজে সরে আসতে চায় না। ক্লাসে উপস্থিতির পরিবর্তে পার্টির অফিসে উপস্থিতিই তাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর পরীক্ষা না দিয়ে তারা সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ছাত্রজীবনের পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে। হলের ছাত্র সংসদ কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে অর্থের দিকে। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কাজ চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। আগে ছাত্ররা শিক্ষকদের কথা শুনতো, এখন শিক্ষকরা ছাত্রদের কথা শোনেন কারাগারে বন্দির মতো।

ছাত্রসমাজের প্রকৃত ছাত্রত্ব ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সরকার ও রাজনৈতিক দল- উভয় পক্ষের। বিরোধী দল যদি নিজের দায়িত্ব পালন করতে অনীহা প্রকাশ করেন বা অসমর্থ হন, তাহলে এককভাবে সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষ নিজের ছাত্র সংগঠনের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলে সাধারণ ছাত্রদের অস্ত্র নিবারণও অসম্ভব হবে না। এই দায়িত্ব যদি কোনো সরকার পালন করতে পারেন তাহলে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারবে। অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের সন্তানকে শিক্ষার জন্য বিদেশের দিকে তাকাবেন না, দেশে ছাত্রসমাজের প্রভাব প্রতিফলন সম্ভব হবে। যে হাতে অস্ত্র আর সন্ত্রাস আছে, সে হাত একজন নিরন্ন মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে না।

নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের প্রতি যে নির্মোহ আবেদন করেছেন তা যেন সবার মধ্যে প্রসারিত হতে পারে মুক্ত চেতনা ও দেশের সার্বিক কল্যাণের দিক মুখ করে। এখন থেকে ছাত্রদের হাতে শোভা পাক বই, খাতা আর লেখনী সামগ্রী, গোপন অস্ত্র নয়। তার লেখনী সগর্বে ঘোষণা করুক : পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দি সোর্ড অব দি গান।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : লেখক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।